



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 394 - 400

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

বঙ্কিমচন্দ্রের ‘মৃণালিনী’ উপন্যাস : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

সমীর মণ্ডল

স্বাধীন গবেষক

Email ID: samirmondal1999@gmail.com



Received Date 28. 09. 2025

Selection Date 15. 10. 2025

Keyword

Historical
Context,
Bakhtiyar Khilji,
Lakshman Sen,
Contemporary
Writings,
Historical
Analysis.

Abstract

Bankim Chandra Chattopadhyay's novel 'Mrinalini' is based on the attack of the Turkish invader Bakhtiyar Khilji on Lakshman Sen, the ruler of Nabadwip in Bengal. In which he highlights the weakness of old Lakshmana Sen and the intrigues of his courtiers. As a result, Bakhtiyar Khilji captured Lakhnauti with only Eighteenth cavalry. I am trying to verify the historical analysis of his novel in this essay. I have tried to explain in the light of history by quoting from the novel. All the names of the characters mentioned in the novel have no historical authenticity. However, despite statistical errors, several similarities are found with the events. My main point here is that there was a big conspiracy behind the defeat of Laxman Sen, the ruler of Lakhnauti. Because it was not possible for Bakhtiyar to defeat the then powerful king Lakshmana Sen of the Sena dynasty with only eighteenth Cavalry. This royal conspiracy is also described quite a bit in the novel. I have discussed this in my article. So anyway, a novel based on history needs a bit of imagination to make it more interesting. But it is our duty to analyze it in a historical light.

Discussion

উনিশ শতকে আধুনিক বাংলা সাহিত্য জগতে যে সমস্ত প্রসিদ্ধমান লেখকদের আবির্ভাব দেখা যায় তার মধ্যে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হলেন একজন অগ্রগণ্য পুরুষ। বিশ্বব্জের মতো বিখ্যাত উপন্যাস প্রকাশের মাধ্যমে তিনি একজন প্রসিদ্ধমান ঔপন্যাসিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ঐতিহাসিক কল্পনাশক্তির সাথে মিলিয়ে তিনি বেশ কিছু ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। ১৮৬৫-১৮৬৯ সাল এই চার বছরে তিনি তিনটি উপন্যাস রচনা করেন। তার মধ্যে তৃতীয় উপন্যাসটি ছিল ‘মৃণালিনী’। ১৮৬৮-৬৯ সালে তিনি এই উপন্যাসটি রচনা করেন। অধ্যাপক Amiya. P. Sen তাঁর ‘Hindu Revivalism in Bengal, 1872-1905 : Some Essays in Interpretation’ নামক গ্রন্থে বলেছেন –

“It is with mrinalini (1869) that Bankim turns from the portrayal of man as the master of his destiny or else of the unaffected innocence of man amidst nature so evident in

'Durgeshnandini' (1865) And 'Kapalkundala' (1866) to a position when grim tragedy and preconceived destiny always threatens to overtake his characters.”²

এই পর্যায় থেকে তিনি ইউরোপীয় ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞানকে তাঁর কল্পনার সাথে মিশিয়ে উপন্যাস হিসেবে তুলে ধরেন।

ঐতিহাসিক পর্যালোচনা : ‘মৃণালিনী’ উপন্যাসে তিনি ত্রয়োদশ শতকের ঈখতিয়ারুদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির বাংলা আক্রমণ করার ঘটনাকে বর্ণিত করেছেন। নবদ্বীপের রাজা লক্ষ্মনসেনকে পরাজিত করে কিভাবে এই অঞ্চলকে দখল করেন তা দেখানো হয়েছে। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী তুর্কো ছিলেন মোহাম্মদ ঘোরের সামরিক প্রধান। তবে তিনি দিল্লির সুলতানের কোন রকম আদেশ ছাড়াই তাঁর সৈন্যদল নিয়ে বিহার - বাংলা আক্রমণ করেন বলে জানা যায়।^১ বখতিয়ার কর্তৃক বিহার-বাংলা কাহিনী লক্ষণ সেনের পক্ষ থেকে সেরকম কেউ লিখে রেখেছে বলে মনে করা হয় না। তবে তাঁর সভাকবি শরণ ও উমাপতিধর এর লেখা থেকে সেনরাজ ও স্লেচ্ছদের মধ্যে একটা সংঘর্ষ হয়েছিল তার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু শরণ ও উমাপতিধরের কোন কাব্যগ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। তবে সদুক্তিকর্ণামৃতে উমাপতিধরের ৯১টি শ্লোক পাওয়া যায় এবং তার রচিত দেওপাড়া লেখ থেকে স্লেচ্ছদের সম্বন্ধে জানা যায় যেখানে তিনি স্লেচ্ছদের আনুগত্য জানিয়ে ভক্তিমূলক স্তুতি লিখেছেন -

‘সাধু স্লেচ্ছনরেন্দ্র, সাধু ভবতো মাতৈব বীরপ্রসুর
নীচেনাপি ভবদ্বিধেন বসুধা সুক্ষত্রিয়া বর্ততে।’

অর্থাৎ স্লেচ্ছরাজকে সাধুবাদ জানিয়ে, তাদেরকে নিচকুলদ্রব হলেও বীরপ্রবাসিনি বলে আখ্যা দিচ্ছেন। এখান থেকে বোঝা যায় লক্ষণ সেন বজ্রিয়ারের আক্রমণে নবদ্বীপ ত্যাগ করে চলে গেলেও তার সভাকবি এই স্লেচ্ছদের সভায় থেকে যান।^৩

“হেমচন্দ্র বিনীতভাবে কহিলেন, - অপরাধ গ্রহণ করবেন না, দিল্লিতে কার্যসিদ্ধ হয় নাই। পরন্তু যবন আমার পশ্চাৎগামী হইয়াছিল; এই জন্য কিছু সতর্ক হইয়া আসিতে হইয়াছিল। তদ্রূপে বিলম্ব হইয়াছে।”^৪

এ সময়ে দিল্লীতে তুর্কো মুসলিম শাসকদের বিজয় অভিযানের প্লাবন বইছিল। ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ ঘোর তরায়নের দ্বিতীয় যুদ্ধে দিল্লী আজমেরের চৌহান বংশীয় রাজপুত তৃতীয় পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করেন এবং দিল্লী ক্রমশ তাদের অধীনে চলে যায়। এখানে দিল্লীতে যবনদের বলতে এই তুর্কো মুসলিম শাসকদের কথা বলা হয়েছে।

“আমি মগধ বিজেতাকে যুদ্ধে জয় করিয়া পিতার রাজ্য উদ্ধার করিব। না হলে মগধ রাজপুত্র নামে কলঙ্ক।”^৫

সপ্তম শতক থেকে মগধের শাসন ব্যবস্থা ছিল পাল রাজাদের অধীন। কিন্তু পরবর্তীকালে একাদশ শতকের শেষেরদিক থেকে পালরাজাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জয়চন্দ্র মগধ দখল করে। এ সময়ে পাল রাজা ছিল পল পাল। অধ্যাপক দিলীপ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে ১১৯৩ সালে মহাম্মদ ঘরি গাহারবাল নৃপতি জয়চন্দ্রকে পরাজিত করে ক্রমশ উত্তর প্রদেশ ও বিহারে তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ১২০০ সালে বজ্রিয়ার খলজি পলপালকে পরাজিত করেন এবং সেখানকার বৌদ্ধ বিহারগুলিকে ধ্বংস করে।^৬ মিনহাজ উদ্দিন সিরাজ তার তাবাকাত-ই-নাসিরি গ্রন্থে তা আলোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে রাজকুমার হেমচন্দ্র বলতে সম্ভবত এই পাল রাজা পলপালের পুত্রকে বুঝিয়েছেন। যে তার পিতার হারানো রাজ্যে উদ্ধার করতে চাই।

“গৌর রাজ্যে গিয়া তুমি অস্ত্র ধারণ করলেই যবন নিপাত হইবে তুমি আমার নিকট প্রতিশ্রুত হও যে, কাল প্রাতেই গৌড় যাত্রা করিবে।... হেমচন্দ্র দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, তাহাই স্বীকার করিলাম কিন্তু একা যুদ্ধ করিয়া কি করিব?

মাধবাচার্য বললেন গৌড়েশ্বরের সেনা আছে।”^৭

সেন নৃপতি বল্লাল সেনের নবম রাজ্য বর্ষে (১১৬৭) ভাগলপুরে একখানি তাম্র শাসন পাওয়া গিয়েছে অধ্যাপক দিলীপ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে সম্ভবত মগধের পাল রাজাদের সঙ্গে সেনদের মিত্রতা ছিল।^৮ যেকারণে এখানে গৌড়েশ্বরের সেনার সাহায্যে কথা বলা হয়েছে। গৌরেশ্বর বলতে লক্ষণ সেনকে বোঝানো হয়েছে। গৌড়েশ্বর লক্ষণ সেন আনুমানিক ১১৭৯ সালে ষাট বছর বয়সে পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন সমকালীন সরকারি দলিলে তিনি গৌড়েশ্বর

বলে অভিহিত হয়েছেন। তবে তার পিতা ও পিতামহ কেউ এই উপাধি গ্রহণ করেছেন বলে জানা যায় না। তার এই অভিধান থেকে মনে হয় সমগ্র উত্তর বাংলা তাঁর পদানত ছিল। তাছাড়া তিনি মগধের গাহরওয়াল নৃপতিকেও পরাজিত করেন এবং ওড়িশার রাজা ও চোদিদের সঙ্গে লড়াই করেছেন। ইতিহাসবিদ অনিরুদ্ধ রায়ের মতে লক্ষণ সেনের ছেলেদের বারাণসী ও এলাহাবাদে স্তম্ভ লেখ পাওয়া যায়। যা থেকে তাঁর সাম্রাজ্যের পরিসীমা বোঝা যায়।^{১৮}

“মাধব আচার্য অল্প হাস্য করিয়া এবার অতুচ্চস্বরে কহিলেন, মহারাজ, তুরকীয়রা আর্যাবর্ত প্রায় সমুদয় হস্তগত করিয়াছে। আপাততঃ তাহারা মগধ জয় করিয়া গৌর রাজ্য আক্রমণের উদ্যোগে আছে।

রাজা কহিলেন— আমি কি করিব- আমি কি করিব? আমার এই প্রাচীন শরীর, আমার যুদ্ধের উদ্যোগ সম্ভবে না। আমার- এক্ষণে গঙ্গালাভ হইলেই হয়। তুরকীয়রা আসে আসুক।”^{১৯}

মিনহাজ উদ্দিন সিরাজের তবাকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে এই বৃদ্ধ রাজা লক্ষণ সেন ভারতের ঘটমান রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে কোন খবর রাখতেন না বিশেষ করে এই সময় উত্তর ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ অবস্থায় ছিল। ১১৯২ সালে মোহাম্মদ ঘুরি আজমিরের শাসক তৃতীয় পৃথ্বীরাজ চৌহানকে তারানের দ্বিতীয় যুদ্ধে পরাজিত করে বারানসি ও কান্নকুবজের গাহর ওয়াল নৃপতি জয়চন্দ্রকে পরাজিত করে ক্রমশ পরাক্রমশালী হয়ে উঠছেন।^{২০} সুতরাং মনে করা যেতে পারে তার বয়সের শেষ দিকে বা বার্ধক্য জনিত কারণে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন।

“সভাপন্ডিত দামোদর প্রথমে কথা কহিলেন, আচার্য আপনি কি ক্ষুব্ধ হইলেন? যেরূপ রাজাজ্ঞা হইল, ইহা শাস্ত্র সঙ্গত। শাস্ত্রের ঋষি বাক্য প্রযুক্ত আছে যে, তুরকীয়রা এ দেশ অধিকার করিবে। শাস্ত্রে আছে আবশ্য ঘটবেস-কাহার সাধ্য নিবারণ করে? তবে যুদ্ধউদ্ভেমের প্রয়োজন কি?”^{২১}

এসব খবর লক্ষণ সেনের কর্ণগোচর হল ততদিনে সমগ্র বিহার বক্তিয়ারের করতলগত। রাজসভার জ্যোতিষীরা প্রচার করলেন যে তুর্কিদের বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই। সমগ্র দেশটাই তাদের পদানত হবে। এবং শাস্ত্রে বর্ণিত তুর্কি বিজেতার সঙ্গে বখতিয়ারের সম্পূর্ণ মিল আছে বলে মনে করে তারা। মিনহাজ উদ্দিনের বর্ণনা অনুযায়ী ব্রাহ্মণরা প্রচার করে, যে ব্যক্তি তাদের আক্রমণ করবে তার হাত দুটো এত বড় যে সোজাভাবে দাঁড়িয়ে হাতগুলো প্রসার করলে আঙুলগুলো তার জানু স্পর্শ করে অর্থাৎ অতিকায় এক পুরুষের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।^{২২} তারপর লক্ষণ সেন তার এক বিশ্বস্ত অনুচরকে এ বিষয়টির সত্যতা জানার জন্য পাঠান। এবং ফিরে এসে সে রাজ জ্যোতিষীদের বর্ণনার সঙ্গে সহমত হন। কিন্তু এগুলো যে ব্রাহ্মণদের সাজানো মনগড়া গল্প তা বুঝতে অসুবিধা হয় না কারণ প্রাচীনকালের হিন্দুশাস্ত্রে বক্তিয়ারের বর্ণনা থাকবে এটা আজকের দিনে বিশ্বাস করার কোন যুক্তি নেই। সুতরাং মিনহাজ উদ্দিনের বর্ণনা অনুসারে লক্ষণ সেনের সভাপন্ডিতরা এটা কোন দিক থেকে মেনে নিল স্বাভাবিকভাবে একটা প্রশ্ন ওঠে।

“সপ্তদশ অশ্বারোহী রাজদারে উপনীত হইল। বৃদ্ধ রাজার শৈথিল্যে আর পশুপতির কৌশলে রাজপুরী প্রায়ই রক্ষক হীন। রাজসভা ভঙ্গ হইয়াছিল। পুরীর মধ্যে কেবল পৌরজন ছিল মাত্র-অল্প সংখ্যক দৌবারিক দ্বার রক্ষা করিতেছিল। একজন দৌবারিক জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কি জন্য আসিয়াছো? যবনেরা উত্তর করিল, আমরা যবন-রাজ প্রতিনিধির দূত; গৌর রাজ্যের সহিত সাক্ষাৎ করিব।”^{২৩}

মিনহাজ উদ্দিন সিরাজ তাঁর তবাকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থে অষ্টাদশ অশ্বারোহীর কথা বলেছেন। লক্ষণ সেনকে পরাজিত করার প্রায় চল্লিশ বছর পর তিনি লখনৌতি বা লক্ষণাবতিতে দু-বছর কাটান এবং সেখানে এক সেনার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। তাঁর মতে আঠারো জন অশ্বারোহীসেনা বণিকের বেশে শহরে প্রবেশ করেন। শহরবাসীরা তাদের অশ্ব বিক্রেতা বলে মনে করে।^{২৪} অধ্যাপক দিলীপ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে শুধু আঠারো জন সেনা ছিল না তার সাথে আরও সেনা ছিল। যারা একটু পিছিয়ে ছিল। তারপর বখতিয়ার তাঁর আসল রূপ নিয়ে প্রাসাদ রক্ষীদের উপর আক্রমণ করে।^{২৫} অনিরুদ্ধ রায়ের মতে এমনটা নয় যে বখতিয়ারের বিহার আক্রমণের পর বাংলা আক্রমণের খবর পেয়ে লক্ষণ সেন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। লক্ষণ সেন রাজমহলের পাহাড়ের গায়ে চিরাচরিত প্রবেশদ্বার বন্ধ করার জন্য তাঁর সৈন্যদল পাঠিয়েছিল। ফলে নদীয়াতে বেশি সংখ্যক সৈন্য ছিল না। এই অকস্মাৎ আক্রমণের সুবিধা নেওয়ার জন্য বখতিয়ার সাঁওতাল পরগনার ভেতর দিয়ে আসার সময় জঙ্গলে বড় সৈন্যদল লুকিয়ে রেখে অষ্টাদশ সৈন্য নিয়ে নদীয়া আক্রমণ করেন।^{২৬}

অপরদিকে এ. বি. এম. হাবীবুল্লাহর মতে বখতিয়ার বিহার আক্রমণের একবছর পরে অর্থাৎ ১২০৪-০৫ সালে কিছু সৈন্য নিয়ে দক্ষিণ গাঙ্গেয় উপত্যকার দিকে অভিযানে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু বিহার ও ঝাড়খণ্ডের দুর্গম পথে সৈন্যরা তাঁর সাথ দিতে পারেনি। ফলে মাত্র অষ্টাদশ সৈন্য নিয়ে তিনি নদীয়া আক্রমণ করেন।^{১৮}

“পৌরজন তুমুল আত্ননাদ করিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করতে লাগিল। সেই ঘোর আত্ননাদ অন্তঃপুরে যথা বৃদ্ধ রাজা ভজন করিতেছিল, তথা প্রবেশ করিল। তাহার মুখ শুকাইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ঘটিয়াছে- যবন আসিয়াছে?... এই বলিয়া মহিষী রাজার অধৌত হস্ত ধারণ করিয়া খিরকিদ্ধার পথে সুবর্ণগ্রাম যাত্রা করিলেন।”^{১৯}

তাবাকাত-ই-নাসিরিতে বলা হয়েছে যে সময়ে বজ্রিয়ার সেন রাজাকে আক্রমণ করেন তখন রায় (লখমনিয়া) ভোজনে বসে ছিলেন তাঁর সম্মুখে স্বর্ণ ও রৌপের পাত্রে ভজন পরিবেশিত ছিল। এই সময়ে রাজপ্রাসাদের আত্ননাদ তার কানে গেলে তিনি ভয়-ভীত হয়ে পড়েন তারপর তিনি খালি পায়ে রাজপ্রাসাদের উল্টোদিক দিয়ে পালিয়ে যান গঙ্গার তীরে সেখানে থেকে নৌকা করে বঙ্গ অভিমুখে যাত্রা করেন।^{২০}

“ষোড়শ সহস্র লইয়া মরক টাকার বখতিয়ার খলজী গৌড়েশ্বরের রাজপুরি অধিকার করিলেন।”^{২১}

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এখানে ষোলোজন আশ্বারহির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মিনহাজউদ্দিন তার গ্রন্থে অষ্টাদশ অশ্বের কথা বলেছেন। এর ফলে বখতিয়ার নদীয়া ও তার সংলগ্ন অঞ্চল ও সেখানকার নারী দাস-দাসী, সম্পত্তি সব তার দখলে চলে আসে বলে জানা যায়। তিনদিন ধরে নদীয়া শহরে অব্যাহত লুণ্ঠ চলে। মিনহাজ উদ্দিন বলেছেন এত ধনরত্ন প্রত্যেকে পেয়েছিল তা বর্ণনা করা যায়না।^{২২} বখতিয়ার তারপর নদীয়া নগর ধ্বংস করে লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন করেন। এই অঞ্চলে তার নামে খুতবা ও মুদ্রার প্রচলন দেখা যায়। এই ধনরত্ন ব্যবহার করে মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ হয়। কিন্তু এটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয় যে বাইরে থেকে মাত্র আঠারো জন অশ্বারোহী নিয়ে এসে বখতিয়ার খলজি লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে সমগ্র নদীয়া জয় করেন। এর পেছনে কোন একটা বড় রাজ চক্রান্ত না থাকলে বজ্রিয়ারের পক্ষে মাত্র কয়েকজন সৈন্য নিয়ে লক্ষণ সেনকে হারানো সম্ভব নয়। ঠিক যেমনি পলাশীর চক্রান্তের কারণে সিরাজউদ্দৌলা মাত্র কয়েকশো ব্রিটিশের হাতে পরাজিত হয়েছিল।

“ষষ্ঠী বছর পরে যবন-ইতিহাসবেত্তা মিনহাজউদ্দিন। এইরূপ লিখিয়াছিলেন। ইহার কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা কে জানে?”^{২৩}

এখানে ৬০ বছর পর মিনহাজউদ্দিন সিরাজ এর ইতিহাস রচনার কথা বলা হলেও তাবাকাত-ই-নাসিরিতে বলা হয়েছে মিনহাজউদ্দিন তার দাদা শামসুদ্দিন (প্রত্যক্ষদর্শী) এর কাছ থেকে ৪০ বছর পরে প্রত্যক্ষদর্শী কাহিনী সংগ্রহ করেন। ১২৬০ (৬৫৮ হিজরি) সালে তাঁর তাবাকাত-ই-নাসিরি গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হয়।^{২৪} এখানে তার সত্যতা এবং গ্রন্থনীয়তা নিয়ে স্বাভাবিক একটা প্রশ্ন রয়েছে তবে এতদিন পরে হলেও একজন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য মোটামুটি ভাবে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

বখতিয়ারের নদীয়া বিজয়ের কাহিনী নিয়ে স্বাভাবিক কয়েকটা প্রশ্ন ওঠে লক্ষণ সেনের মতন একজন শক্তিশালী রাজা যিনি বেশ কয়েকটি রাজ্য বা অঞ্চল দখল করেছিলেন তিনি কেন বখতিয়ারের মাত্র অষ্টাদশ অশ্বারোহীর আক্রমণ শুনে পালিয়ে গেলেন? অথচ রাজজ্যোতিষরা তাঁকে শাস্ত্রে যবন আক্রমণের ভয়ভীতি দেখালেও তিনি পলায়ন করেননি। আর যদিও বা তার সৈন্যদল রাজমহলের পথ অবরুদ্ধ করার জন্য নিয়োজিত ছিল, তাই বলে তাঁর এত বড় রাজপ্রাসাদে কোনো সতর্ক প্রহরী বা রক্ষী ছিল না তা মানা যায় না এবং উনি যখন সমস্ত পরিকল্পনা মাফিক তাঁর সৈন্যদলকে পাঠাচ্ছেন তখন নিশ্চই তাঁর রাজপ্রাসাদ সুরক্ষার জন্য কিছু সৈন্য রাখবেন। আর যদি মিনহাজউদ্দিনের বর্ণনা মানতে হয় তাহলে এসময় বখতিয়ার সম্পূর্ণ খবর পেয়েই এসেছিল। এ. বি. এম হাবীবুল্লাহ বলেছেন এক বৌদ্ধ ব্যক্তি বখতিয়ারকে এসমস্ত খবর ও পথ দেখিয়ে দেন। বৌদ্ধরা সেনদের বিরুদ্ধে ছিল ঠিক, কিন্তু যে বখতিয়ার বিহারের বৌদ্ধ মঠগুলিকে ধ্বংস করেছেন তাকে এই বৌদ্ধ ব্যক্তি সাহায্য করবেন এটা কিছুটা হলেও মানা শক্ত। সম্ভবত কারণ তিনি রাজ চক্রান্তের শিকার হয়েছিলেন। তুর্কি অশ্বারোহীরা প্রাসাদে ঢোকার সময় প্রাসাদেরক্ষীরা পর্যন্ত সেরকম কোনো বাধা দেয়নি। অপরদিকে শাস্ত্রে

তুর্কি আক্রমণের ভয় দেখিয়ে মন্ত্রীরা রাজাকে নদীয়া ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার কথা বললেও শাস্ত্রে সেরকম কোন তুর্কির নাম বা বর্ণনা উল্লেখ নেই। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে এরকম তুর্কি আক্রমণের কথা উল্লেখ থাকা বিশ্বাসযোগ্য বা যুক্তিযুক্ত নয়। সুতরাং এটা মনে করা স্বাভাবিক রাজ চক্রান্ত করে শাস্ত্র নকল করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত, উপন্যাসে ‘পশুপতি’ নামক রাজপুরুষ সম্ভবত সেই রাজ চক্রান্তের স্রষ্টা যিনি রাজপদ লাভের জন্য যবনদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিলেন।

“এই পরামর্শ করিয়া মাধবাচার্য সেই রাত্রিতে হেমচন্দ্রকে নবদ্বীপ হইতে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করাইলেন হেমচন্দ্রকে নতুন রাজ্যে স্থাপিত করিবার জন্য তাহার সঙ্গে গেলেন।”^{২৫}

লক্ষণ সেনের রাজত্বের শেষ দিকে তার রাজ্যের মধ্যে ভাঙ্গন ধরতে শুরু করে। বহিরাগত আক্রমণ ও বিদ্রোহের কারণে ছোট ছোট অঞ্চলে খন্ডিত হয়ে যায় এবং বেশিরভাগ এলাকা তার হাতের বাইরে চলে যায়। শ্রীডোম্মল পালদেবের তাম্র শাসন থেকে বোঝা যায় ডোম্মল পাল নামক এক বৌদ্ধ নৃপতি সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন।^{২৬} সুতরাং উপন্যাসে উল্লেখিত হেমচন্দ্রের নতুন রাজ্য বলতে সম্ভবত ডোম্মল পাল দেব এর প্রতিষ্ঠাতা রাজ্যকে বোঝানো হয়েছে। যিনি নবদ্বীপের দক্ষিণে সমুদ্র তট সংলগ্ন সুন্দরবনের এলাকায় নতুন রাজ্য স্থাপন করেন।

“হেমচন্দ্রকে নতুন রাজ্য স্থাপন করিয়া মাধবাচার্য কামরূপ গমন করিলেন। সেই সময়ে হেমচন্দ্র দক্ষিণ হইতে মুসলমানের প্রতিকূলতা করিতে লাগলেন বজ্রিয়ার খিলজী পরাভূত হইয়া কামরূপ হইতে দূরীকৃত হইলেন। এবং প্রত্যগমনকালে অপমানে ও কষ্টে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল।”^{২৭}

বখতিয়ার লখনৌতি দখল করার পর তিব্বত অভিযানের জন্য প্রস্তুত হন। এ.বি.এম. হাবীবুল্লাহ মতে এটি একটি পাগলের পরিকল্পনা ছিল।^{২৮} সম্ভবত এসময়ে বখতিয়ার তিব্বত থেকে আসা ঘোড়ার ব্যবসায়ী একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। কারণ এসময়ে তিব্বতি ঘোড়ার চাহিদা ছিল ব্যাপক। পাল ও সেন যুগে এখান থেকে প্রচুর ঘোড়া আমদানি হত।^{২৯} সম্ভবত একারণে হয়তো বখতিয়ারকে নদীয়ার মানুষগণ ঘোড়া ব্যবসায়ী ভেবেছিল। যাইহোক, এরপর বখতিয়ার তাঁর অধঃস্তন মুহম্মদ শেরানকে লখনৌতির সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে তিনি আনুমানিক ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে তিব্বতের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তাবাকাত-ই-নাসিরি গ্রন্থে বলা হয়েছে লখনৌতি ও তিব্বতের মধ্যস্থলে অবস্থিত পার্বত্য অঞ্চলে তিন জাতির বসতি ছিল। কোচ মেচ ও থরো। চেহারাই এরা সকলেই তুর্কিদের মতো এই কোচ ও মেচ জাতির ‘আলী মেচ’ নামক এক প্রধান বখতিয়ারের আনুগত্য স্বীকার করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তিনি বখতিয়ারকে তিব্বতের পার্বত্য অঞ্চলে নিয়ে যাওয়ার কথা দেন। তারপর মর্দান কোর্ট নামক এক নগরে বখতিয়ারকে নিয়ে যান।^{৩০} প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এখানে লখনৌতি ও তিব্বতের মধ্যস্থল এর পার্বত্য অঞ্চল বলতে সম্ভবত উত্তরবঙ্গের হিমালয় পাদদেশীয় অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে। এই মর্দানকোটের সামনে একটি বড় নদী রয়েছে। তাবাকাত-ই-নাসিরিতে এই অসাধারণ বিশালতার নদীকে ‘বাঁকমতি’ (কেউ কেউ একে বঙ্গমতি বা রঙ্গমতি নদী বলেছেন) নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই নদীকে গঙ্গার থেকে তিন গুণ বড় বলে মনে করা হয়েছে। হিন্দুস্তানের মাটিতে প্রবেশ করলে এটিকে ‘সমুন্দর’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।^{৩১} তারপর আলি মেচ তাদেরকে প্রস্তর নির্মিত সিলহাকো নামক সেতুর সামনে নিয়ে আসেন। বখতিয়ার সেতু অতিক্রম করার পর কিছু সৈন্যকে সেতু রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রেখে যান। যাতে ফিরে আসার সময় তা যেন অক্ষত থাকে। কিন্তু তিব্বত থেকে বখতিয়ার ফিরে আসার ঘটনা কামরূপের হিন্দুগণ যখন জানতে পারে তখন তারা সমস্ত কিছু ভেঙে জ্বালিয়ে দেয়। তার ফলে বখতিয়ার কামরূপের হিন্দুদের আক্রমণে প্রাণ সংকটে পড়লে সীমিত সংখ্যক সৈন্য নিয়ে নদী অতিক্রম করে প্রাণে বাঁচেন সেখান থেকে দেওকোটে পৌঁছে অত্যাধিক মানসিক চিন্তায় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং মারা যান।^{৩২}

Reference:

১. Sen, P, Amiya (2001), Hindu Revivalism in Bengal, 1872-1905: Some essays in interpretation, পৃ. ১০২
২. রায়, নীহাররঞ্জন (১৯৮০), বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫০৬

৩. তদেব, পৃ. ৫০৭
৪. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম চন্দ্র, মৃণালিনী, আদিত্য প্রকাশালয়, এপ্রিল, ১৯৫১, পৃ. ২
৫. তদেব, পৃ. ২
৬. গঙ্গোপাধ্যায়, দীলিপকুমার, ভারত ইতিহাসের সন্ধান(দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, সাহিত্যলোক, ২০২১, পৃ. ১৯-২০
৭. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম চন্দ্র, মৃণালিনী, আদিত্য প্রকাশালয়, এপ্রিল, ১৯৫১, পৃ. ৬
৮. গঙ্গোপাধ্যায়, দীলিপকুমার, ভারত ইতিহাসের সন্ধান(দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, সাহিত্যলোক, ২০২১, পৃ. ৩৭৮
৯. রায়, অনিরুদ্ধ, মধ্যযুগের বাংলা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ২০১২, পৃ ২২
১০. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম চন্দ্র, মৃণালিনী, আদিত্য প্রকাশালয়, এপ্রিল, ১৯৫১, পৃ. ৩২
১১. গঙ্গোপাধ্যায়, দীলিপকুমার, ভারত ইতিহাসের সন্ধান(দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, সাহিত্যলোক, ২০২১, পৃ. ৪২০
১২. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম চন্দ্র, মৃণালিনী, আদিত্য প্রকাশালয়, এপ্রিল, ১৯৫১, পৃ. ৩২
১৩. সিরাজ, মিনহাজউদ্দীন, তবাকত-ই-নাসিরি (বাংলা অনুবাদ), আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ২৫
১৪. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, মৃণালিনী, আদিত্য প্রকাশালয়, এপ্রিল, ১৯৫১, পৃ. ১০৭
১৫. সিরাজ, মিনহাজউদ্দীন, তবাকত-ই-নাসিরি (বাংলা অনুবাদ), আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ২৬
১৬. গঙ্গোপাধ্যায়, দীলিপকুমার, ভারত ইতিহাসের সন্ধান(দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, সাহিত্যলোক, ২০২১, পৃ. ৪২০
১৭. রায়, অনিরুদ্ধ, মধ্যযুগের বাংলা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ২০১২, পৃ ২৪
১৮. হাবীবুল্লাহ, এ. বি. এম, ভারতে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠা ১২০৬-১২৯০, বাংলা অনুবাদ অনিরুদ্ধ রায়, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, আগষ্ট, ২০০৭, পৃ. ৮৪
১৯. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, মৃণালিনী, আদিত্য প্রকাশালয়, এপ্রিল, ১৯৫১, পৃ. ১০৮
২০. সিরাজ, মিনহাজউদ্দীন, তবাকত-ই-নাসিরি (বাংলা অনুবাদ), আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ২৭
২১. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, মৃণালিনী, আদিত্য প্রকাশালয়, এপ্রিল, ১৯৫১, পৃ. ১০৯
২২. সিরাজ, মিনহাজউদ্দীন, তবাকত-ই-নাসিরি (বাংলা অনুবাদ), আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ২৯
২৩. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, মৃণালিনী, আদিত্য প্রকাশালয়, এপ্রিল, ১৯৫১, পৃ. ১০৯
২৪. সিরাজ, মিনহাজউদ্দীন, তবাকত-ই-নাসিরি (বাংলা অনুবাদ), আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ২৮
২৫. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, মৃণালিনী, আদিত্য প্রকাশালয়, এপ্রিল, ১৯৫১, পৃ. ১৩৮
২৬. রায়, নীহাররঞ্জন (১৯৮০), বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫০৫
২৭. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম চন্দ্র, মৃণালিনী, আদিত্য প্রকাশালয়, এপ্রিল, ১৯৫১, পৃ. ১৩৯
২৮. হাবীবুল্লাহ, এ. বি. এম, ভারতে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠা ১২০৬-১২৯০, বাংলা অনুবাদ অনিরুদ্ধ রায়, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, আগষ্ট, ২০০৭, পৃ. ৮৭
২৯. Hussain, Syed Ejaz, Silver Flow and Horse Supply to Sultanate Bengal with Special Reference to Trans-Himalayan Trade (13th-16th centuries) journal of the Economic and Social History of the Orient, 56 (2013), পৃ. ২৮৯
৩০. সিরাজ, মিনহাজউদ্দীন, তবাকত-ই-নাসিরি (বাংলা অনুবাদ), আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৩০

৩১. তদেব, পৃ. ৩১

৩২. তদেব, পৃ. ৩২